একক ৩ ❑ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.০ প্রবন্ধ ঃ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (নির্বাচিত অংশ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৩.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

৩.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

৩.০ প্রবন্ধ ঃ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (নির্বাচিত অংশ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

....মোগল যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ আসিল। ইংরেজ ধীরে-ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে, আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহন যুগ, [২] "ইয়ং-বেঙ্গাল"-এর যুগ, [৩] বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম পরিচয়ের যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষৎকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্য্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিক ভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এ দেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে, ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব—এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্ত-ই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার মতো সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না; কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত অথবা ইংরেজি-শিক্ষাকারী জনগণের মনে তাঁহারা একটি ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভুদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—জীবন ধীরমন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মতো এতটা সর্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মতো এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙালী জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য—কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[২] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্য্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময়—সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্‌চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটি হইয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ এবং কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সংকটে বেশি করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নুতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বেহুশঃ বাঙ্গালী সমাজে ও পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পূর্বে বিচারিত আধুনিক যুগান্তরের কালের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত, বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছে; ইংরেজের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অর্থনৈতিক সংকট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জুড়িয়া বড়ো চাকুরী ও প্রভূত সম্মান, উভয়ই পাইয়া আসিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, সুদূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া, দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঁচজনের সমাজে এতাবৎ বাঙ্গালী বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ইংরেজের অনুচর হইয়া এবং রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী বলিয়া, এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিল; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে সুখের দিন আর নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হইতেছে; অন্নাভাবে তাহাকে নিজ বাসভূমেও পরবাসী হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু এতদিন ধরিয়া যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সাহচর্য্য ছিল, সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলোৎপাটনের চেষ্টা হইতেছে—নূতন প্রচারিত বিনাশ-ধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নিজেকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সে শিক্ষা আর তাহার জীবনে কার্য্যকর হইতেছে না; সে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবন-যাত্রার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। দেশে তেমন বড়ো চিন্তানেতা নাই, যিনি তাহাকে যথার্থ দিগ্‌দর্শন করান,তাহার কর্তব্য বলিয়া দেন, বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে পরিচালিত করেন।

এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত—কেবল যা তা সাহিত্য নহে—বড়ো সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্ফুর্ত জীবনী-শক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্মশীলতা না থাকিলে সে জাতির মধ্যে কি প্রকারের সাহিত্য জন্মলাভ করিবে? এই যুগের পূর্ববর্তী কালের দুই-চারিজন সাহিত্যরথী বিদ্যমান, তাঁহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি। যুগ-ধর্মের ফলে, বাঙ্গালীর অতি-আধুনিক সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প কয়েক জন প্রতিভাশালী লেখককে বাদ দিলে) উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া উঠিতেছে না।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস এবং কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সংকট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাব-প্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে;—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধূসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টি জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি তাহার মধ্যে কর্মশক্তি নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়া লইয়াছি; রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব-সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান কার্যতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সংগীত রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মতো কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা দৈব-দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহা-ই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার-বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মতো জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—ইহ সর্বপ্রধান দিক্ও নহে। প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালী-গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার-সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের সংগীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটি বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটি দিক্—নিছক ভাব-প্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সব-ই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফুর্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে, সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন,—সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগডালে বারি-সেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কী আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কী আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্য্যা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রি কোনও রকমে টিকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সর্ব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ-কার্য্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; যে শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের কার্য্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী; এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশি রকম করিয়া বর্হির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটি বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তিগত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টি-বদ্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘ-গতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়-ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,—আবার সমাজকে, সংঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কি ভাবে এ কার্য্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়া-ই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্য্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে। বাঙ্গালীকে আবার একটা বাঁধা-ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায় আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায়

আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অন্নচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫/২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটী-অর্জন' করিতে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে। আমার মনে হয়, তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা বৈগুণ্যে সে তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এসব কিছু হইবে না',—এইরূপ নিরুৎসাহ বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ-কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্শা; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব—প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য; রায়বেশে নাচ, বাঙ্গালার কোনও-কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালোবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটি মনোহর অভিব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীয় নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতোই একটি প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংগীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এসব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য্য এবং আর্য্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং

রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন।

৩.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ২৬.১১.১৮৯০— মৃত্যু ২৯.৫.১৯৭৭)

প্রখ্যাতভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। পিতার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ ও ১৯১৩ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করার পর কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রীঃ সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই তিনি বেদকে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করেন। আদ্য-মধ্যের দাবি ছাড়িয়ে নিজের তাগিদে নিরুক্ত, পাণিনি, পতঞ্জলির সঙ্গে এসে যুক্ত হল দুটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঃ পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত। এই সময়ে 'An essay towards an Historical and comparative Grammar of the Bengali Language' বিষয়ে 'The Sounds of Modern Bengali' নামে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' বৃত্তি ও 'Comparative Philology with Special reference to the Bengali Dialeces' প্রসঙ্গে গবেষণার ফলস্বরূপ 'জুবিলি' গবেষণা পুরস্কার পান। তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Origin and Development of Bengali Language'। পরবর্তীতে এই নামে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের (১৯২৬)পরে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লন্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব, প্রাকৃত, পুরনো আইরিশ ভাষা পড়েন। পরে প্যারিসে সরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্ব, স্লাভ ও ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব, অস্ট্রো-এশিয় ভাষাতত্ত্ব, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস ইত্যাদি পড়েন ও গবেষণা করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও শ্যামদেশ ভ্রমণে যান। তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থটিতে সে সময় ও সে সব দ্বীপ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে লোকগাথা সংগ্রহ করেন। বাল্টিক রাজ্যগুলির জাতিগোষ্ঠির ওপর তাঁর লিখিত পুস্তিকা সেখানে ভ্রমণকালে খুব সমাদৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভাষাচার্য্য' উপাধি দেন। তবে শুধু ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান নয়, সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের সহযোগিতায় তিনি চন্ডীদাসের প্রামান্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইংরেজীতে জয়দেবের পরিচিতি লেখেন এবং বিশ্ব সাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেন। শেষজীবনে 'রামায়ণ' এর উৎস সম্বন্ধে তাঁর রচনা ও আলোচনা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সঙ্গীত, চিত্রকলা বিষয়েও তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল : 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০); 'ইউরোপ' (১৯৩৮), 'ইউরোপ ভ্রমণ' (প্রথম খন্ড : ১৯৩৮); দ্বিতীয় খন্ড : ১৯৪৫), 'সাংস্কৃতিকী' (প্রথম খন্ড : ১৯৬১, দ্বিতীয় খন্ড : ১৯৬৫) ; তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে, মৃত্যুর পরে।

৩.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

মোগল যুগ চলাকালীনই বাংলাদেশে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি আসে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজও এদেশে আসে ও এখানে ক্ষমতায় আসীন হয়। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙ্গালির সাহচর্য্যে বাংলা সংস্কৃতিতে যে যুগান্তর আসে, তা এখনও চলছে। এই যুগান্তরের চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখা যায়—

(১) রামমোহন যুগ—ইউরোপীয় মনের সঙ্গো বাঙালি মনের প্রথম পরিচয়ের সময় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রামমোহন এই যুগের প্রতীক, তিনি উপনিষদের সঙ্গো ইউরোপীয় চিন্তার সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজের গতিশীলতার বোধটি না থাকায় এই সামঞ্জস্য ঠিক পথ পেল না। তিনি নিজেও ব্যক্তিজীবনে বৈরাগ্যযুক্ত না হওয়ায় লোকপূজিত ধর্মগুরু হতে পারেন নি।

(২) ইয়ং-বেঙ্গল এর যুগ—দ্বিতীয় যুগে কিছু তীক্ষ্ণধী বাঙালি যুবক প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গো অপরিচয়ের ফলে এর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তারা নানাভাবে ইউরোপীয় রীতিনীতি জীবনযাত্রার প্রণালী ভারতবর্ষের ওপর আরোপ করতে চাইল। একাজে তারা সাফল্য না পেলেও এখানকার ইংরেজী শিক্ষিত বা শিক্ষাকামী জনগনের মনে তারা একটা ছাপ রাখতে পেরেছিল।

(৩) বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ—এই যুগে (১৮৬০-১৯০০) প্রাচীন ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গো ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ জিনিসের মিশ্রণে যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা তখনও এত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। ফলে সে সময়ে বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দে বাঙালির পক্ষে হিতকর, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধকর কথা পাওয়া যায়। সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলেই বঙ্কিম-মধুসূদন বাঙালির জন্য চিরন্তন রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

(৪) অতি আধুনিক যুগ বা লড়াইয়ের পরের যুগ—এই যুগের মূল কথা, বাঙালির জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচন্ড আঘাত, বাঙালির জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন এবং আদর্শ-বিপর্যয়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও এই আর্থিক অবনতির এক প্রধান কারণ, অর্থনৈতিক সংকট বাঙালির সামাজিক আদর্শকেও প্রভাবিত করেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে বাঙালি, ইংরেজী শিখে ইংরেজের আনুগত্য করেছে। ফলে তার অর্থনৈতিক সংকট ছিল না। সমগ্র ভারতের সম্মান ও সে পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাঙালি বাইরে থেকেও বিতাড়িত, নিজভূমেও পরবাসী। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে তুলেছিল, তারও মূলোৎপাটনের চেষ্টা হচ্ছে বিনাশধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এই পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গো মানিয়ে নিতে না পেরে ও যথার্থ চিন্তা নেতার অভাবে বাঙালি ক্রমশঃ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবে এই অবস্থার মধ্যেও বাঙালি মহান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু যথার্থ জীবনীশক্তির অভাবে অল্প কয়েকজনের কথা বাদ দিলে সেই চেষ্টা সার্থক হচ্ছে না। বাঙালির মানসিক চর্চা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়—

(ক) বাঙালি ভাব-প্রবণ জাতি একথা সত্যি হলেও ভাবপ্রবণতাই বাঙালির একমাত্র পরিচয় নয়। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে শতেক বৈষ্ণবপদ ও কিছু আখ্যায়িকা, আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে মধুসূদনের কিছু কাব্য, বঙ্কিমের কিছু উপন্যাস ও রবীন্দ্রসাহিত্য—এটুকুই বাঙালির লক্ষ্যনীয় সাহিত্যকীর্তি। কিন্তু অন্য প্রদেশের মানুষের তুলনায় বাঙালি ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা না করতে পারার জন্য, বাঙালিকে কল্পনাপ্রবন ভাবুক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি আমাদের নিজেদেরও গর্বিত করেছে, ফলে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে আমরা দৈব-দুর্বিপাক বলে মনে করেছি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই আমাদের ভাবুক প্রাণের চরম প্রকাশ ঘটেছে—এই প্রচারকে আমরা বাঙালিরাও সত্য বলে মনে করতে শুরু করেছি।

কিন্তু বাস্তবত আমরা জ্ঞানের সাধনাহীন, কর্মহীন—শুধুই ভাবপ্রবণ জাতি নই। কল্পনা প্রবণতা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটি দিক মাত্র। প্রাচীনকালে কীর্তন, কবি, পাঁচালীগানের আখড়ায় যেমন বাঙালি সংস্কৃতির

প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলেও বাঙালির জ্ঞানের দিকের প্রকাশ ঘটেছে। বাংলার নব্যন্যায়, সংস্কৃত কাব্য, মধুসূদন সরস্বতী বা আধুনিক কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিকদের দান ভারতের জ্ঞানের ধারাকে পুষ্ট করেছে। বর্তমানে বাঙালি হিন্দুর সংকট উপস্থিত। তার কল্পনাশক্তি লুপ্ত হচ্ছে, ফলে এখন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সফল হবে না। এই সংকটকালে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করাও অশোভনীয়। এখন প্রয়োজন, বাঙালির যে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি আছে, তার অনুশীলন।

(খ) প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যে কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, দুই প্রকার শক্তি কাজ করে, তার সামঞ্জস্য সাধনেই কল্যাণ। বাঙালির অতিরিক্ত বহির্মুখী প্রবণতাকে এখন কিছুটা অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের দোহাই দিয়ে বহির্মুখীনতাকে প্রশ্রয় দিলেও সমষ্টিগত উন্নয়নে উল্টোটাই প্রয়োজন। সমষ্টিগত চর্যা ছাড়া সমাজ টিকতে পারে না। বর্তমানে বাঙালিকে ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে সমাজস্বার্থকে স্থান দিতে হবে। দেশ-কালের উপযোগী নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই সংকট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে। একাজের জন্য প্রয়োজন নিজ জাতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি ও অপরের প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে জ্ঞান আলোচনা ও অনুশীলন।

(গ) কর্মী নয় বলে বাঙালির একটা অপবাদ আছে, কারণ নিজভুমে ভাতের অভাব না হওয়ায় অন্য প্রদেশের মানুষের মত বাঙালিকে দেশছাড়া হতে হয়নি। কিন্তু প্রয়োজনে বাঙালি তা পারে, তার প্রমাণ ময়মনসিংহের বাঙালি কৃষক এখন আসাম, বর্মা, শ্যামদেশে কাজের প্রয়োজনে যাচ্ছে। বাঙালির মধ্যে এই যে কর্মশক্তির তাড়না আসছে, তাকে উৎসাহিত করা উচিত। 'কবি ও ভাবুকের জাতি' আখ্যা দিয়ে নিরৎসাহিত করা উচিত নয়।

(ঘ) কেউ কেউ আবার বাঙালির বাঙালিত্বের দিকে ঝোঁক দিয়ে তার শক্তি জাগাবার চেষ্টা করছে। তারা বলছেন, বাঙালি বিশ্বের সেরা শিল্পী জাতি। কিন্তু এই দাবী হাস্যকর, যদিও বাংলার শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে মনোহরত্ব আছে। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বা শিল্পে নন্দলাল বসু আছেন বলেই প্রমাণ হয় না যে সমস্ত বাঙালি জাতিই কবি বা শিল্পী।

ভারতের অন্যান্য জাতির মত বাঙালি ও একটি প্রধান জাতি। আমাদের ভাবুকতা, বুদ্ধি, শিল্পবোধ সবই আছে। ভারতের সভ্যতায়, সাহিত্যে, সংগীতে বিদ্যায়, গবেষণায় শিল্পে, ভাস্কর্যে বাঙালির দান বিশ্বজনের মাঝেও কৃতিত্বের। বিশ্ব তা কিছু পরিমাণে স্বীকারও করেছে। তবে এ নিয়ে আমরা অনুচিত গর্বও যেমন করব না, তেমনি যে কোনো অবস্থায় আমরা যে কৃতকার্য হতে পারি, এ আত্মবিশ্বাসও আমাদের থাকা উচিত।

শেষের কথা এই যে, অনার্য এবং আর্য পূর্বসূরিদের থেকে বাঙালি যে মনন পেয়েছে তা নিন্দার নয়। নৈসর্গিক চারিপাশ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা এখনো পূর্ণ হয়নি—আমাদের জ্ঞান ও কর্ম দিয়ে তাকে পুষ্ট করতে হবে। বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কল্পনা ভাবুকতার তুলনায় জ্ঞান ও কর্মের দিকেই আমাদের ঝোঁক হওয়া উচিত। এই আমার নিবেদন।

৩.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাঁচীতে 'হিন্দু ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব' কর্তৃক আহূত সাহিত্য-সম্মেলনে (কার্তিক ২১, ১৩৪১) সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন। পরে স্বল্প সংযোজন সহ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গশ্রীর' পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এটি সহ মোট সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনটি সংস্করণের পর এই প্রবন্ধটি বাকী পাঁচটি

প্রবন্ধের সঙ্গে 'ভারত-সংস্কৃতি' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ নিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করা হবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙালি জাতির গঠন, বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিক ও বাঙালির সাহিত্যিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর আরো আলোচনা পাওয়া যাবে বিশেষ করে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' এবং 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' প্রবন্ধগ্রন্থে। 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশে প্রাবন্ধিক মূলতঃ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমটি হল, বাংলাদেশে ইংরেজদের আসার পরে ইংরেজদের সঙ্গে সংস্পর্শে বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তন। দ্বিতীয়টি হল—বাঙালির তথাকথিত ভাবালু পরিচয় পরিত্যাগ ও জ্ঞান এবং কর্মানুশীলনে মনোযোগী হওয়া।

প্রথম অংশের বক্তব্যে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের প্রথম থেকে প্রবন্ধ রচনা পর্যন্ত সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। কারণ তাঁর মতে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালির সাহচর্য্যে বাঙালি সংস্কৃতির যে পরিবর্তন, তা চারটি আলাদা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই চারটির মধ্যে প্রথম পর্যায়কে তিনি বলেছেন—রামমোহন যুগ। তাঁর মতে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালি সাহচর্য্যের প্রথম যুগের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের মূর্ত সংকটে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেও অকৃতদার পুরুষ ও কুমারী মেয়ের সংখ্যা বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

বাংলা সংস্কৃতির এই চারটি পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন যে, একদিকে বুদ্ধিমান জাতি বলে বাঙালির খ্যাতি আছে, অন্যদিকে ইংরেজী ভাষা শিখে ইংরেজদের আনুগত্য করে আসায় একটা বড় সময় ধরে বাঙালি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও পেয়েছে। ফলে সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দুইই বাঙালির ছিল। কিন্তু বাঙালির সে সুখের দিন আর নেই, একদিকে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়েছে অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান মিলে যে বাংলা সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল, আজ তাকেও ভাগ করার চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় বাঙালি যদি আগের মত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকেই প্রধান কাজ বলে মনে করে তবে তা সফল হবে না।

প্রবন্ধের প্রথম অংশ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে, তিনি চারটি পর্যায়ে ভেঙে বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সাধারণভাবে গ্রাহ্য। তবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা নির্দিষ্টভাবে বললে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-শিক্ষা নিয়ে তাঁর দুর্বলতা আছে সেটি চারটি পর্যায়ের আলোচনা থেকেই পরিস্কার। প্রথম পর্যায় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেকারণেই বলেন সে সময় বাঙালির 'ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন' ছিল, ফলে তাঁরা সাবধানী হতে পেরেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে' এই পর্যায়ের বাঙালি ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আর তৃতীয় পর্যায়কে তিনি যাদের নামে নামাঙ্কিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ সরাসরি হিন্দু পুনরুত্থানবাদের নেতা ছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুত্বের ভিত্তিতে একটি জাতীয়তাবাদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা আজ বহু গবেষক দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে প্রাবন্ধিক বাঙালিকে জ্ঞান ও কর্মমুখী করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি' এই প্রচারের মধ্যে অত্যুক্তি আছে। বহুল প্রচারের ফলে বাঙালি নিজেও এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, সে শুধুই ভাবপ্রবণ জাতি, কারণ বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্রের গান রাষ্ট্রীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে, বাঙালি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পাচ্ছেন। ফলে যেন কবিতা আর গানই বাঙালির মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। কিন্তু এই প্রচার ঠিক নয়। ভাবুকতা, কল্পনা প্রবণতা, সাহিত্য প্রীতি—এগুলি বাঙালির মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক মাত্র।

প্রাচীন কালে সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকে বাঙ্গালি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমনি পণ্ডিতের টোল থেকে বিচারসভায়, দর্শনে, প্রত্নতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাঙালির জ্ঞানের দিকও প্রকাশ পেয়েছে। এখন বাঙালি হিন্দুর প্রবল সংকট উপস্থিত। এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা ত্যাগ করে জ্ঞান ও কর্মশক্তির আবাহন করা উচিত।

রামমোহন রায় উপনিষদের সঙ্গে ইউরোপের চিন্তার একটা সামঞ্জস্যসাধন তিনি করতে চেয়েছিলেন এটি প্রাবন্ধিকের মতে যথাযথ প্রচেষ্টা হলেও উপনিষদেই যে ভারতের সভ্যতার শেষ নয়, ভারতের সভ্যতা যে গতিশীল এই বোধ রামমোহন বা তাঁর অনুগামীদের ছিল না। এদেশের মানুষের কাছে রামমোহনের পূজনীয় না হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে তিনি মনে করেছেন যে, এদেশের মানুষ বৈরাগ্য চিত্ত যুক্তদেরই ধর্মগুরু হিসেবে পুজো করে, যে চিত্তের অধিকারী ছিলেন না রামমোহন।

দ্বিতীয় পর্যায়কে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'ইয়ং বেঙ্গালের যুগ', তাঁর মতে এই সময় কিছু তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ইউরোপের সমস্ত কিছুকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে শুরু করল। তারা ভারতীয় সমাজকে ইউরোপের আদলে বদলে দিতে চাইল। প্রাবন্ধিকের মতে 'ইয়ং বেঙ্গালের' সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এমন শক্তি বা সংখ্যা ছিল না, যাতে তারা তৎকালীন সমাজকে ওলট-পালট করে দিতে পারে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বা ইংরেজী শিক্ষাকর্মী মানুষদের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গালের চিন্তাধারা কিছু ছাপ রেখে যেতে পেরেছিল।

তৃতীয় পর্যায়কে প্রাবন্ধিক যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন এবং এ পর্যায়ের নামকরণ করেছেন বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের নামে। তাঁর মতে উনিশ শতাব্দীর ছয়ের দশক (১৮৬০) থেকে বিশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা, প্রবন্ধ রচনার সময়কালের মত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষণীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িক ইউরোপীয় প্রগতিশীল ঐতিহ্যের এক ধরণের সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন, যা বাঙালির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। এই সমন্বয়কে অনুভব এবং অনুশীলন করেছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙালির জন্য এমন চিরস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

চতুর্থ পর্যায়কে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'অতি আধুনিক যুগ' বা 'লড়াইয়ের পরের যুগ' অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কে তিনি এই নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় সভ্যতার ভয়ানক আগ্রাসী রূপ। এই সময়ে বাঙালির জীবনেও অর্থনৈতিক অবনতি ও তার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন দেখা গেল। এর সাথে ঘটনা হিসেবে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। প্রাবন্ধিকের মতে এই সময়ে বাঙালি জীবনে যে ইউরোপীয় প্রভাবের প্রচন্ডতা, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ সংবাদপত্র সাহিত্য ইত্যাদির বহুল প্রচারের হাত ধরে ইউরোপের জীবন বাঙালির আজ অতি পরিচিত। এই সময়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বাঙালি জীবনের সামাজিক আদর্শেরও পরিবর্তন। কন্যাপণ প্রচলিত থাকার কারণে এবং পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা সমাজে কম থাকায় এতদিন নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাঙালির মধ্যে প্রৌঢ় বয়সে বিয়ের চল ছিল। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক প্রাবন্ধিকের আরো বক্তব্য হল এই যে, বর্তমানে বাঙালির ব্যক্তিত্ব বিকাশের তুলনায় সামগ্রিক জাতিগত বিকাশ প্রয়োজন। সে কারণে বাঙালিকে সমাজগত চর্যার দিকেই বেশী জোর দেওয়া উচিত। ব্যক্তিত্বের প্রসারের পরিবর্তে সমষ্টিগতভাবে অবস্থান নেওয়াই এখন বেশী প্রয়োজন। এখন বাঙালির উচিত অন্তর্মুখী হওয়া। নিজ জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান, আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই

বাঙালি আবার নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যতদিন বাঙালির নিজভূমে ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি ততদিন সে পরবাসে যায়নি;; কিন্তু যখনই আবশ্যক হবে তখনই বাঙালিকে যে কোন জায়গায় যেতে হবে। বাঙালিকে নতুন করে শ্রমিক ও কর্মি হতে হবে। কোনো কোনো মহল থেকে বাঙালির শক্তিকে অন্যভাবে জাগানোর চেষ্টা চলছে। প্রচার চালানো হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বাঙালির মত শিল্পী-সাহিত্যিক কোনো জাতি নেই। আমাদের গ্রাম শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রচার চলছে। কিন্তু এ প্রচার হাস্যকর। এই শিল্পগুলির মধ্যে মনোহারিত্ব থাকলেও এগুলি বিশ্বের সেরা এ বক্তব্য ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে বাঙালিও ভারতের অন্য জাতির মতই আরেকটা জাতি আমরা ভারতীয় সভ্যতাকে সাহিত্যে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে অনেক কিছু দিয়েছি, যা বিশ্বের দরবারেও স্বীকৃত, কিন্তু তা নিয়ে অনুচিত গর্ব করা উচিত নয়। আর্য-অনার্য মিশ্রণে বাঙালি যে মানসিকতার অধিকারী হয়েছে তা নিন্দার নয়, যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা এখনো পূর্ণতা পায়নি, জ্ঞান ও কর্মানুশীলনের মাধ্যমেই তাকে পূর্ণতা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাবন্ধিক যখন এ প্রবন্ধ রচনা করছেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে কারণে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল অর্থাৎ সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারকে বিশ্বের কোন্ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে, বাজারের ভাগ বাটোয়ারায় পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির বিন্যাস কি দাঁড়াবে তার সমাধা হয়নি। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল বিশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রথম থেকেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট, Economic Depression নামে যা পরিচিত। যাকে সামাল দিতে গিয়ে বিশ্ব নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্ম হ'ল কেইনসীয় অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্বসংকটের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও এসে পড়েছিল। এর সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আস্থা না রাখতে পারায় মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল। এর কিছু যথার্থ কারণও আজ ঐতিহাসিক-গবেষকরা নির্ণয় করেছেন। তাঁদের মতে, ভারতীয় জাতীয়তার নামে উনিশ শতাব্দীতে যা তৈরি হচ্ছিল তা আসলে বর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বিষয় এবং ভাষাতেও তা ফুটে উঠেছিল। দেশকে মাতৃমূর্তি হিসেবে কল্পনা করানোর মধ্যে দিয়েই মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই প্রাবন্ধিক বলেছেন, হিন্দু-বাঙালির সংকট। এ সংকট বাঙালি যেমন সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল না, তেমনি উপলব্ধি করলেও এর থেকে মুক্তির উপায় তার সামনে ছিল না। কারণ বস্তুগতভাবে বাংলাদেশের উর্বর জমি কখনো এ জায়গার অধিবাসীদের খাদ্য সংকটে ফেলেনি। আর এতদিন বাঙালি ইংরেজদের আনুগত্য করায় সম্মান এবং ক্ষমতা দুইই পেয়েছে। প্রাবন্ধিক বাঙালিকে কল্পরাজ্য থেকে বাস্তবে টেনে নামাতে চাইলেন, বাঙালির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। তিনি যে কত দূরদর্শী ছিলেন তা বোঝা যায় এখন, বাঙালি জাতির দুরবস্থা দেখলে, অথচ আমরা সেই ক্লিশে বচন এখনো আউড়িয়ে চলেছি 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' তবে প্রথম অংশের মত এখানেও বলতে হয় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তার অসম্ভব আস্থা ছিল বলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাধু ও চলিত উভয় গদ্যরীতিতে প্রবন্ধ রচনা করলেও নির্বাচিত প্রবন্ধের গদ্যরীতি সাধুবাংলা। এখানে তিনি মূলতঃ একাধিক কমা বা সেমিকোলন দিয়ে বাক্য সাজিয়েছেন। তবে তাঁর এ প্রবন্ধে যুক্তিপরম্পরা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও তাঁর 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা একজন ইতিহাসমনস্ক প্রাবন্ধিককেও পাই।